বিশ্লেষণধর্মী ঐতিহাসিক নিবন্ধ রচনা ঃ নীতি ও পদ্ধতি

সিরাজুল ইসলাম*

জ্ঞানের যেকোন শাখায়, তা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, আইন বা ভূগোল যে বিষয়ই হোক না কেন, একটি সন্দর্ভ বা গবেষণামূলক নিবন্ধ রচনা করতে হলে তা মূল বিষয়ের নির্ধারিত পরিপ্রেক্ষিতে রচনা করা অপরিহার্য। সকল বিষয়ের ক্ষেত্রেই এ নীতি প্রযোজ্য। যেমন, সমাজতাত্ত্বিক বিষয়ে নিবন্ধ রচনা করতে হবে সমাজতত্ত্বেরই বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে, ইতিহাস বিষয়ে নিবন্ধ রচনা করতে হবে ইতিহাসেরই নির্ধারিত পরিপ্রেক্ষিতে, ইত্যাদি। কথাটি স্পষ্ট বোধগম্য হলেও একজন অনভিজ্ঞ প্রতিবেদক তা প্রায়শ ভুলে যান এবং তাঁর কি বলতে হবে এবং কিভাবে বলতে হবে তা স্থির করতে গিয়ে তিনি অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ান। তা হলে 'পরিপ্রেক্ষিত' বলতে কি বুঝবো? একজন শিল্পী এর সঙ্গে বেশী পরিচিত। কারণ তিনি তাঁর শিল্পকর্ম শুরু করার পূর্বেই তাঁর পরিপ্রেক্ষিতটি স্পষ্টভাবে স্থির করেন। শিক্ষার বৃহত্তর পরিসরে প্রত্যেকটি বিষয়েরই পৃথক পৃথক পরিপ্রেক্ষিত রয়েছে এবং তা জানার বা বোঝার সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একজন বিদগ্ধ ও বিশিষ্ট লেখকের রচনা পাঠ করা। আর্নোল্ড টয়েনবি তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন যে, তিনি ইতিহাস বিষয়ে তাঁর পরিপ্রেক্ষিত নির্ধারণ করেছেন কিছু কালজয়ী রচনা পাঠ করে। একবার ইতালীতে অবসর যাপনকালে এক রাতে তিনি মনে মনে তাঁর পরিপ্রেক্ষিতের একটি রূপরেখা তৈরি করেন এবং তিনি এ রূপকল্পকে বাস্তব রূপদান করেন পরবর্তী ত্রিশ বছরে। এরকম বড়ো লেখক আরো অনেক আছেন, যাঁরা কেবল পরিপ্রেক্ষিত তৈরি করতে বছরের পর বছর সময় নিয়েছেন। তাঁদের মতে, সবচেয়ে বড়ো কাজটি হচ্ছে দৃশ্যপট তৈরি করা। এর পর বাকী থাকে সামান্য শ্রম ও সময় ব্যয় করে তা উপস্থাপন ও সমাপ্ত করার কাজ। পদ্ধতির (technique) দিক দিয়ে এক লেখক থেকে অন্য লেখক এবং এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ের ভিন্নতা রয়েছে। ঐতিহাসিক পদ্ধতিও তাই অন্য বিষয়ের পদ্ধতি থেকে স্পষ্টভাবে ভিন্ন। যদিও ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে অবিমিশ্র বিজ্ঞানের

* *অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।*

পদ্ধতির মর্যাদা বজায় থাকে না, তথাপি ইতিহাসের রয়েছে নিজস্ব বিজ্ঞান, যা তার কঠোর বুদ্ধিবৃত্তিক দাবি মেনে চলে এবং তা অবিমিশ্র বিজ্ঞানের পদ্ধতির চেয়ে কোন অংশে কম আয়াসসাধ্য নয়। এক্ষেত্রে গবেষকের হাতে তথ্যাবলী থাকে, কিন্তু এসব তথ্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিন্যস্ত করার ক্ষমতা না থাকলে এবং নির্জীবনকে জীবন দানের বৈজ্ঞানিক কৌশল জানা না থাকলে সেসব তথ্য ছাইভস্মের মতো অসার বস্তুই থেকে যাবে।

রচনার একটি লক্ষ্য অবশ্যই থাকতে হবে

কোন লেখকই অকারণে কিছু লিখেন না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি লিখেন কোন সম্পাদক, সমিতি বা দলের আহবানে সাড়া দিয়ে, এমন কি তাঁর উচ্চাভিলাষী স্ত্রীর অনুরোধে, যিনি তার স্বামীকে দেখতে চান বিশিষ্ট পন্ডিতদের কাতারে। যদি বিভিন্ন বইতে মুদ্রিত লেখকের স্বীকারোক্তিগুলো সত্যি হয়, তা হলে বলতেই হবে লেখককে লেখার জন্যে অনুপ্রাণিত করেন তাঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা। লেখক কদাচিৎ লিখেন তাঁর বিবেকের তাড়নায় এবং এরূপ ক্ষেত্রে তার অন্তরের আহবানে যদি তিনি সাড়া দেন তা হলে তাঁর লেখাটি একটি মহান সৃষ্টি না হয়ে যায় না। কারণ তিনি রচনা করেন একটি ধ্রুব লক্ষ্যকে সামনে রেখে, যা লেখকের সামনে স্পষ্টভাবে উদ্ভাসিত হয় পূর্ণ চাঁদের মতো। লেখার একটি উদ্দেশ্য অবশ্যই থাকতে হবে। ধরুন, আপনাদের সমিতির সভাপতি আপনকে বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন একজন নতুন গবেষককে কিভাবে চিন্তা করতে হবে, গবেষণা করতে হবে এবং লিখতে হবে তা নির্দেশ করে একটি নিবন্ধ রচনা করার জন্যে। এভাবেও লেখার বিষয় নির্ধারিত হতে পারে যদিও তা চাপিয়ে দেয়া হয় বাইরে থেকে। কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়। এই উদ্দেশ্য আপনাকে চালিত করবে রচনাবিজ্ঞান সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ের দিকে, যেমন–যেসব পাঠক ও শ্রোতাদের জন্যে এসব লেখা, তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক মান, অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্য, উপাত্ত সংগ্রহ ও বিন্যাসের নিয়মাবলী, বিষয়বস্তুসমূহ বিন্যাস ও রচনার পদ্ধতি, ইত্যাদি। এভাবে লেখক নিশ্চিতভাবে জেনে নেন, কাদের উদ্দেশ্যে তিনি লিখছেন এবং তাঁরা তাঁর কাছ থেকে কি পেতে চান। আর এভাবে আপনার লক্ষ্যও নির্ধারিত হয়ে যায় এবং এর পর আপনার কাজ হচ্ছে প্রাসঙ্গিক সূত্রগুলো পর্যালোচনা করে ধারণা গঠন, এর রূপরেখা প্রণয়ন এবং পরিকল্পিত রূপরেখা পূরণ এবং টাইপকরণ। এটাই কাজ।

আসুন এবার একটি সমালোচনামূলক লেখার লক্ষ্য কিভাবে স্থির করা হয় তা বোঝার জন্যে কিছু বাস্তব দৃষ্টান্ত যাচাই করে দেখি। দৃষ্টান্ত হিসেবে ধরা যাক, বিশিষ্ট একজন পন্ডিত এক আলোচনাসভায় জোর দিয়ে বল্লেন, সাম্প্রদায়িকতার কারণে ভারত বিভক্ত হয়েছে এবং চাকুরির ক্ষেত্রে হিন্দু–মুসলমানের বৈষম্যের কারণে সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হয়েছে। তিনি রাষ্ট্রের বিভিন্ন সেক্টরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের চাকুরিজীবীদের পরিসংখ্যান তুলে ধরে তার দাবি প্রতিষ্ঠা করলেন। এতে চাকুরিক্ষেত্রে

চাকুরি বন্টনে বৈষম্যের কথা সুস্পষ্টভাবে জানা গেল। কাজেই এই পন্ডিত জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের জন্যে শ্রোতাদের হাততালি পেলেন, কিন্তু সভার একজন সচেতন শ্রোতা হিসেবে আপনি তাঁর কাছে প্রশ্ন রাখলেন, "আপনি যেহেতু মনে করেন রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বেকারত্ব নিয়োগপ্রাপ্তির মতোই গুরুত্বপূর্ণ, বরং অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ, তা হলে দয়া করে বলুন দুটি সম্প্রদায়ের বেকারত্বজনিত বর্তমান অবস্থাটা কি?" পন্ডিত মহোদয় বৈষম্যতত্ত্বের প্রেক্ষিতে অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনা করে আপনার প্রশ্নটি অগ্রাহ্য করলেন। সম্ভবত তাঁর বক্তব্য সত্য। কিন্তু এতে আপনি স্বস্তি পেলেন না। তাই আপনি নিজেই এ সম্পর্কে একটি অনুসন্ধান শুরু করলেন এবং দেখতে পেলেন যে হিন্দু সম্প্রদায়ে বেকারের শতকরা হার শিক্ষিত মুসলমানদের বেকারের চেয়ে অনেক বেশী। থোক সংখ্যার দিক দিয়ে হিন্দু চাকুরিজীবীরা অধিকতর প্রভাবশীল, কারণ তাদের মধ্যে অদিকতর ও প্রভূত সংখ্যক লোক শিক্ষাগত ডিগ্রীর অধিকারী। এরপর আপনি আরও অনুসন্ধান করতে শুরু করলেন কেন এরূপ হলো জানার জন্যে। শীঘ্রই আপনি জানতে পারলেন যে, হিন্দুরা নবাবী আমলেও চাকুরিক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল এবং এর পরেও তারা শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের চেয়ে বেশী এগিয়ে যায়; মুসলমানদের অধিকাংশই তখন ছিল চাষী, তাঁতী, কারিগর প্রভৃতি এবং তারা শিক্ষার তেমন ধার ধারতো না এবং রাষ্ট্রেরও তোয়াক্কা ততোটা করতো না। আপনি আরও আবিষ্কার করলেন যে, বাংলাদেশে শত শত বছরের মুসলিম শাসনামলে স্থানীয় মুসলমানদের লেখাপড়া শিক্ষা দানের জন্যে এবং রাষ্ট্রের আস্থাযুক্ত ও দায়িত্বশীল পদে তাদের নিয়োগের জন্যে কোন নীতি গ্রহণ করা হয়নি। অবাঙালী আশরাফ মুসলমানরা মনে করতো স্থানীয় আতরাফ মুসলামানদের লেখাপড়া শিক্ষাদান এবং হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে এবং আশরাফ ও আতরাফের সামাজিক ব্যবধান দূর করা রাজনৈতিকভাবে অনুকূল নয়। এখন আপনি ভারত বিভাগের মূল কারণ সম্পর্কে বিকল্প তত্ত্ব দাঁড় করিয়ে এ যুক্তি প্রদর্শন করতে পারেন যে, হিন্দু ও মুসলমানের বৈষম্য হিন্দুদের সৃষ্টি নয়, বৃটিশের সৃষ্টিও নয়; বরং তা হচ্ছে পূর্ববর্তী মুসলমান আমলের সৃষ্টি। সুতরাং একেই আপনি আপনার নিবন্ধের লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করলেন। এখন আপনার কাজ হচ্ছে বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষিত দলিলসমূহের ভিত্তিতে আপনার যুক্তি উপস্থাপন করা। দেখুন, অনেক গবেষণার পর আপনার নিবন্ধের লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে, হঠাৎ করে নয়। তবে একজন অতি অভিজ্ঞ বিজ্ঞানী কাজ শুরু করেই তাঁর লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারেন এবং তিনি গোড়াতেই কিছু পূর্বস্বীকৃত ধারণা গ্রহণ করতে পারেন এবং পরে তা পরীক্ষা করতে পারেন। যদি দেখা যায় যে প্রচুর পরিমাণ পূর্বস্বীকৃত ধারণা টিকিয়ে রাখা যাচ্ছে না, তা হলে ওগুলো বর্জন করে নতুন একটি পূর্বস্বীকৃত ধারণা সামনে রেখে কাজ করবেন এবং এভাবেই কাজ চলতে থাকবে। একজন সূক্ষ্মদর্শী ঐতিহাসিক যদি ব্যাপক অভিজ্ঞতার অধিকারী না হন, তা হলে তিনি এভাবে অগ্রসর হতে পারেন। কিন্তু এভাবে একের পর এক লক্ষ্য নিয়ে পরীক্ষা করা কেবল তখনই সম্ভব, যখন গবেষক তাঁর অভিজ্ঞতা ও বিষেজ্ঞসুলভ জ্ঞানের মাধ্যমে স্বজ্ঞার আলোকে সত্যকে উপলব্ধি করতে পারেন। এ হচ্ছে সময়

বাঁচানোর একটি উপায়। তবে এ পদ্ধতি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। দীর্ঘ সময় ও প্রচুর অর্থ ব্যয়ের পরও তা অকার্যকর প্রমাণিত হতে পারে। কাজেই কম অভিজ্ঞতাসম্পন্ন গবেষকের জন্যে সবচেয়ে নিরাপদ উপায় হচেছ লক্ষ্য নির্ধারণের পূর্বে কিছু প্রাথমিক গবেষণা পরিচালনা। এরূপ গবেষণার মাধ্যমে যে নিবন্ধ রচিত হবে তা পূর্বেকার গবেষণাজাত নিবন্ধের চেয়ে অধিক পরিমাণে বাস্তব সুফল বয়ে আনতে পারে। অনেক কৃতবিদ্য গবেষক–নিবন্ধকারের বিরুদ্ধে যুক্তিসঙ্গতভ।বে অভিযোগ করা হয় যে, তাঁরা প্রথমেই উপসংহার লিপিবদ্ধ করেন এবং তারপর কেবল পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্যে রচনার কাছে অগ্রসর হন। এটি হচ্ছে প্রচারসর্বস্ব ব্যক্তি, আদলতের উকিল, কূটনীতিক, কমিশন–এজেন্ট এবং এধরনের ব্যক্তিদের পদ্ধতি এবং একজন ঐতিহাসিকের পদ্ধতি এটি নয়। একজন ঐতিহাসিক তাঁর গবেষণার লক্ষ্য নির্ধারণ করে মনে করেন না যে তিনি সত্যের সন্ধান লাভ করেছেন। লক্ষ্য নির্ধারণের মাধ্যমে তিনি শুধু একথাই বোঝান যে, তিনি অনুসন্ধানকার্য শুরু করেছেন। বিজ্ঞানী কাজ চালাবার জন্যে যে পূর্বানুমান (working hypothesis) গ্রহণ করেন তার মতো ঐতিহাসিকের লক্ষ্যও যে কোন সময় পরিবর্তিত হতে পারে যখন তিনি দেখতে পান যে, কিছু অকাট্য নজির–স্বাক্ষ্য তাঁর অনুমানের ধারাকে অস্বীকার করছে। এরূপ অবস্থায় ঐতিহাসিক অবিলম্বে নতুন লক্ষ্য নির্ধারণ করেন এবং চূড়ান্তভাবে তা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত অনুসন্ধান প্রক্রিয়া চালিয়ে যান। সুতরাং একথা স্পষ্টভাবে জেনে রাখা যাক যে, ঐতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষক একটি লক্ষ্য সামনে রেখে কাজ শুরু করেন, কিন্তু যখনই এরূপ সন্দেহ করার কারণ ঘটে যে, তিনি অনুসন্ধানের জন্যে যে লক্ষ্য স্থির করেছেন তা সুফল প্রদান করছে না, তখনই তিনি তা বর্জন করে আরেকটি নতুন লক্ষ্য স্থির করবেন।

আপনি কি বলবেন তা স্থির করুন

যে–কোন পাঠযোগ্য ও স্মরণযোগ্য নিবন্ধেরই পাঠকদের নিকট নিবেদন করার জন্য একটি বক্তব্য থাকে। এটি সকলের জ্ঞাত কোন বক্তব্য নয়। অবশ্যই এটি হবে এমন একটি আলোকশিখা, যা অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করবে – এমন একটি সত্য, যা এখনো অজানাই রয়ে গেছে। উপমাস্বরূপ, যদি গবেষক তাঁর নিবন্ধে বলেন যে, তিনি একটি ফলকের সন্ধান পেয়েছেন, যা চন্দ্রদ্বীপের রাজাদের বংশ তালিকা সংশোধন করেছে। এ তথ্য প্রদানের মাধ্যমে তিনি জ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন এবং তাঁর এ অনন্য অবদানের জন্যে তিনি সহকর্মীদের প্রশংসা অর্জন করেছেন। যদি এই প্রশংসাধন্য গবেষক পরবর্তীকালে তাঁর শীষ্যদের বলেন যে, তিনি গবেষণা করে প্রমাণ করেছেন যে, কলিকাতায় 'ব্লাকহোল' ঘটনা কখনো ঘটেনি, তাহলে তাঁকে তখনই খারিজ করে দেয়া হবে এবং তিনি এত বেশী পরিমাণে বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে ফেলবেন যে, ইতোপূর্বে চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ সংক্রান্ত তাঁর আবিষ্কারও সন্দেহজনক বিবেচিত হবে। কাজেই গবেষকের নীতি হবে – বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানের প্রতিকূলে অকাট্য স্বাক্ষ্যপ্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত সে জ্ঞানকে চ্যালেঞ্জ করবেন না। আপনাকে নিশ্চয়ই নতুন কিছু বলতে হবে

এবং অবশ্যই প্রশ্নাতীত স্বাক্ষ্যপ্রমাণ ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতেই তা বলতে হবে। ইতোমধ্যে সকলের পরিজ্ঞাত কোন বিষয়কে পুনর্ব্যক্ত না করে বরং আপনি মৎস শিকারে যান। একটি সমালোচনামূলক ঐতিহাসিক নিবন্ধ পাঠকের মনোযোগ লাভের দাবি রাখে, কারণ হয় তা কোন বিষয়ে নতুন আলোকসম্পাত করে নয়তো বিষয়টিকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করে বর্তমান জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে। বাংলাদেশের একজন অত্যন্ত সম্মানিত জাতীয় অধ্যাপক একদিন এ লেখককে বলেন যে, তিনি তাঁর সারাজীবন কিছুই লিখেননি, কারণ তার নতুন কিছু বলার নেই। কেন তিনি একথা বললেন? তিনি প্রচুর বইপুস্তক পাঠ করেছেন, তাঁর নিজস্ব একটি বিরাট গ্রন্থাগার আছে এবং তাঁর কাছে ধ্রুপদী রচনা (classics) ও নতুনতম প্রকাশিত সকল বই আছে। এসব বই পাঠ করে লব্ধ জ্ঞান তাঁকে একথা বলতে প্রণোদিত করে যে, তিনি যা বলতে চান ইতোমধ্যে অন্যরা তা বলে ফেলেছেন। সুতরাং তিনি কেবল পড়েই চলেছেন, কখনো লিখেন না। তিনি হচ্ছেন সেই পর্যায়ের পণ্ডিতদের দলভুক্ত যাঁদের পরোৎকর্ষবাদী (Perfectionist) বলা হয়। তাঁরা বরাবরই তাঁদের গবেষণা সম্পর্কে অসন্তুষ্ট থাকেন এবং সর্বদাই পূর্ণাঙ্গ বা নিখুঁত জিনিস উৎপাদনের চেষ্টায় থাকেন কিন্তু হায়, কেবল বিধাতাই পূর্ণাঙ্গতার অধিকারী, মানুষ তা কখনো অর্জন করতে পারে না এবং তাই এসব পরোৎকর্ষবাদী কদাচিৎ লিখতে পারেন। অবশ্যই পরোৎকর্ষবাদীগণ আলোচক হিসেবে আকর্ষণীয় ও কৌতূহল–উদ্দীপক ব্যক্তিত্ব এবং আলোচনার টেবিলে তাঁদের সঙ্গে চা খেয়ে এবং কোন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে পরমানন্দ লাভ করা যায় এবং প্রচুর জ্ঞানলাভ করা যায়। কিন্তু মডেল বা আদর্শ হিসেবে তাঁদের কখনো অনুসরণ করা যাবে না। তাঁরা নতুন কিছু বলতে অক্ষম বিধায় কোন বিষয় গভীরভাবে উপলব্ধি ও পর্যবেক্ষণ করতেও তাঁরা সক্ষম নন, অনুসন্ধান করে কোন কিছু আবিষ্কারের ক্ষমতাও তাঁদের নেই।

পরোৎকর্ষবাদী পর্যায়ের পণ্ডিতদের বিপরীত মেরুতে আরেক ধরনের পণ্ডিত আছেন, যাদের 'সদা প্রস্তুত লেখক' নামে অবিহিত করা যায়। তাঁরা অনতিবিলম্বে এবং এক দিনের নোটিশে লিখে দিতে পারেন। তাঁরা প্রতি মাসে আলোচনা সভায় যোগদান করতে পারেন এবং প্রত্যেক বারই সভায় নিবন্ধ উপস্থাপন করতে পারেন। এসব চটপটে বুদ্ধিজীবী অসংখ্য বইয়ের লেখক হিসেবে গর্ব করেন। তাঁরা এসব বই সম্পর্কে একঘেঁয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন এবং কখনো নতুন আবিষ্কার সম্পর্কে আলোচনা করেন না। পরোৎকর্ষবাদীগণ আদৌ ক্ষতিকর ব্যক্তি নন। তাঁরা তাঁদের বন্ধ্যাত্বের জন্যে গর্ব করেন না। কিন্তু লিখার জন্য এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা লেখকগণ দম্ভ ও তর্জনগর্জন করে বেড়ান এবং শ্রোতাদের বিরক্তি উৎপাদন করে হরহামেশা তাঁদের বন্ধ্যাত্ব জাহির করেন। তাঁরা বিস্তর ঘুরে বেড়ান। ব্যাপক সামাজিক যোগাযোগ রক্ষা করেন এবং প্রচুর অর্থও আয় করেন। তাঁরা অন্যদেরও তাঁদের দলে ভেড়াতে চান, কারণ তাঁদের দল ভারী করার জন্যে তাদের কায়েমী স্বার্থ রয়েছে। এসব ভবঘুরে বুদ্ধিজীবী নিজেরা টিকে থাকবার জন্যে এবং তাঁদের অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে সত্যিকার হুমকিস্বরূপ বিদ্যমান নিবেদিত লেখকদের দাবিয়ে রাখার জন্যে তাঁদের দল ভারী করতে চান। জ্ঞানান্বেষার বিশুদ্ধতা বজায় রাখার জন্যে

এবং এর মর্যাদা সমুন্নত রাখার জন্যে সতর্কভাবে এদের এড়িয়ে চলা উচিত। লেখক হিসেবে যাঁরা নিবেদিত, তাঁরা অবিচল ধৈর্যের সাথে প্রত্যক্ষ করেন, পর্যবেক্ষণ করেন এবং আবিষ্কার করেন। তাঁরা তাঁদের শ্রমের ফসল লাভের জন্যে বছরের পর বছর অপেক্ষা করেন এবং যদি সারাটি জীবন অনুসন্ধান করেও কিছু যদি আবিষ্কার করতে পারেন তা হলেও তাঁরা নিজেদের ভাগ্যবান বলে মনে করেন। তাঁদের একমাত্র আনন্দ ও সন্তুষ্টি এই যে, তাঁরা বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারে কিছু অবদান রেখেছেন।

আরম্ভ করাই সবচেয়ে বড়ো অন্তরায়

গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষককে সবচেয়ে বড়ো যে বাধাটি অতিক্রম করতে হয়, তা হচ্ছে গবেষণা শুরু করার সমস্যা। একনিষ্ঠভাবে গবেষণাকাজ শুরু করার জন্যে মোহাফেজখানায় (archive) না যাওয়ার হাজারো কারণ রয়েছে। যে গবেষক প্রথম গবেষণা কাজ শুরু করেন তাঁর বেলায় একথা বিশেষভাবে সত্য। ভয়, বাধা নিষেধ, দ্বিধা, সংশয়, অনিশ্চয়তা, সহকর্মী ও বন্ধু-বান্ধবদের নিরুৎসাহ, অন্যান্য পেশাগত কাজের চাপ, সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যাওয়ার তাগিদ, ক্লাশ নেবার দায়িত্ব (যদি গবেষক একজন শিক্ষক হন), অসুস্থতা এবং অন্য অনেক কারণ গবেষণা শুরু করার কাজকে বিলম্বিত করে থাকে, এমন কি এসব কারণে অনেকে গবেষণার উদ্যম ও প্রেরণাও চিরতরে হারিয়ে ফেলেন। একারণেই বলা হয় যে, কোন কাজ যথাযথভাবে এবং গুরুত্ব সহকারে শুরু করতে পারলে কাজের অর্ধেক সমাপ্ত হয়ে যায়। যথাযথভাবে কাজ শুরু করা যায় কিভাবে? যথাযথভাবে কাজ শুরু করার প্রথম নীতি হচ্ছে সংশ্লিষ্ট বিষয় সংক্রান্ত বিদ্যমান রচনাদি সংগ্রহ করা। মনে করুন, পালতোলা জাহাজ চলাচলের যুগে ভারত মহাসাগরে সামুদ্রিক দুর্ঘটনা সম্পর্কে আপনি অনুসন্ধান চালাতে চান। এখন এই বিষয়ে প্রাপ্তি সাধ্য সকল বইপত্রের একটি তালিকা তৈরি করে 'ক' শ্রেণীভুক্ত করা যায়; অন্যান্য এলাকায় সামুদ্রিক দুর্ঘটনা সংক্রান্ত বইপত্রের একটি তালিকা তৈরি করে 'খ' শ্রেণীভুক্ত করা যায় এবং এরপর পালতোলা জাহাজ, ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে তার ভঙ্গুরতা, বিশ্বের জলবায়ু, নাবিকগণ, তাদের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি সংক্রান্ত বইপত্রের তালিকা 'গ' শ্রেণীভুক্ত করা যায়। এ পর্যায়ের যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে অনুসন্ধান ও গবেষণা আপনার বিশেষ সমস্যাটি চিহ্নিত করতে এবং আপনার লক্ষ্য নির্ধারণ করতে আপনাকে সক্ষম করবে। যদি দেখা যায় যে, বৃটিশ জাহাজ অপেক্ষা ফরাসী জাহাজ অধিক পরিমাণে দূর্ঘটনা কবলিত হয়েছে,তা হলে এই দুই ধরনের জাহাজের নির্মাণ প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করা যেতে পারে। অথবা যদি দেখা যায় যে, বাণিজ্য জাহাজ অপেক্ষা জলদস্যুদের জাহাজ গড়পড়তা বেশী পরিমাণে দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে, তা হলে জলদস্যুতা ও শান্তিপূর্ণ নৌ-বাণিজ্যের মধ্যে কার্যকর পারস্পরিক সম্পর্ক-রেখা টানা যেতে পারে। সকল শ্রেণীর অর্ন্তভূক্ত বিষয়ে যাবতীয় বইপত্র পাঠ করে আপনি নিজেকে প্রশ্ন করতে পারেন, আরও কি কি ক্ষেত্র শূণ্য রয়েছে যেগুলো সম্পর্কে কোন বইপত্র নেই, অথবা যেসব বইপত্র আছে সেগুলো আপনার জিজ্ঞাসার সন্তোষজনক জবাব দেয় কিনা। আপনি দেখতে পেলেন,

আপনার জন্যে জাহাজডুবি ব্যবস্থাপনা এখনো একটি শূণ্য ক্ষেত্র। এ পরিপ্রেক্ষিতে ভারত মহাসাগরে জাহাজডুবি সম্পর্কে গবেষণার সম্ভাব্যতা ও সুযোগ আছে দেখে আপনি আনন্দিত হলেন। কাজেই আপনার গবেষণা সাফল্যজনকভাবে শুরু হলো এবং গবেষণা যতোই এগিয়ে গেল ততোই আপনি উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত বোধ করলেন। এভাবে একদিন আসবে, যেদিন আপনি একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে বলতে পারবেন কিভাবে পালতোলা জাহাজ চলাচলের যুগে ভারত মহাসাগরে জাহাজডুবির ব্যাপারে কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো। এভাবেই এ বিষয়ে বিশ্বের জ্ঞানভান্ডারে একটি নতুন অবদান যুক্ত হবে।

আপনার নোটগুলো যেন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে না যায়

গোড়ার দিকে আপনার কৃত নোট, যা পরে সম্ভবত পন্ডশ্রম বলে বিবেচিত হবে এবং বাতিল করা হবে, অবশ্যই আপনার নির্বাচিত বিষয়ে রচিত অন্তত দুটি নিবন্ধ বা গ্রন্থের মূলপাঠ থেকে গৃহীত হতে হবে। তবে আপনার গবেষণা বিষয়ে সকল নিবন্ধ ও বইয়ের একটি পূর্ণ তালিকা আপনার কাছে না থাকার সম্ভাবনাই বেশী। যদি তা হতো, তা হলে আলোচ্য সমস্যা সম্পর্কে প্রচুর জ্ঞান থাকার যুক্তিতে আপনি বিষয়টি নির্বাচন করতেন না। যে কয়েকটি বই ও নিবন্ধ আপনাকে বিষয়টি সরাসরি জানার সুযোগ দেয় সেগুলো আপনার গবেষণাকাজ শুরু করার জন্যে অমূল্য সম্পদ, কিন্তু অচিরেই আপনি সেগুলোকে ছাড়িয়ে গিয়ে নতুন জগতে প্রবেশ করবেন যা এখনো সকলের অজানা রয়েছে এবং যা সম্পর্কে আপনি নিজেও ইতোপূর্বে জ্ঞাত ছিলেন না। কিন্তু এ জগত অত্যন্ত অবিন্যস্ত, বিশৃঙ্খল এবং ভয়াবহরূপে বিদঘুটে। এর কোনো কিছুই সরাসরি প্রকাশের উপযোগী নয়। এক্ষেত্রে উৎসের স্তূপ থেকে আপনাকেই প্রয়োজনীয় উপাদান বেছে নিতে হবে। এতে যদি আপনি আপনার পথ কঠোরভাবে অনুসরণ না করেন তা হলে শীঘ্রই আপনি মোহাফেজখানার নথিপত্রের জঙ্গলে হারিয়ে যাবেন। সম্প্রতি সড়ক ও পরিবহন বিষয়ে গবেষণারত একজন পিএইচডি গবেষক আমার কাছে এসে অভিযোগ করেন যে, তিনি তাঁর উৎসগুলো গুছিয়ে নিতে অসমর্থ হয়ে পড়েছেন, কারণ এই বিষয়ে জাতীয় মোহাফেজখানায় ফোলিও-নথির হাজার হাজার ভলিউম রয়েছে এবং তাঁর পক্ষে সারা জীবনেও এগুলোর সবই পড়ে শেষ করা সম্ভব হবে না। তা বেশ। কিন্তু যখন তাঁকে বলা হলো নথিগুলো কিভাবে গুছিয়ে নিতে হবে এবং কিভাবে নথি নির্বাচন করে তা থেকে নোট নিতে হবে, তখন তিনি সাহস সঞ্চয় করলেন এবং নিজের গৃহীত যথাযথ পন্থায় কাজ শুরু করলেন। শীঘ্রই তিনি ফিরে এসে জানালেন যে তাঁর সকল উৎসই তিনি বিন্যস্ত করে নিয়েছেন এবং এগুলো আদৌ পর্যাপ্ত নয়। তাঁকে অবশ্যই আরো প্রাসঙ্গিক উৎস সংগ্রহের জন্যে বিদেশের বৃহত্তর মোহাফেজখানায় যেতে হবে।

বাঁধাইকৃত অথবা খোলা পাতাযুক্ত নোটবইতে অথবা শূন্য ইনডেক্স-কার্ডে যাবতীয় নোট লিপিবদ্ধ করতে হবে। তবে যা-কিছু নির্বাচন করা হোক তা শেষ পর্যন্ত অনুসরণ করতে হবে, কারণ সর্বশেষে সকল নোটের শ্রেণীবিভাগ করে দফাওয়ারীভাবে গুচ্ছবদ্ধ করতে হবে। এরূপ শ্রেণীবিভাজন অত্যন্ত অদক্ষতাপূর্ণ হবে যদি নোট-কাগজ বা কার্যগুলো হরেক রকম আকারের হয়। কারণ অনুসন্ধান শেষে আপনার গবেষণা-পরিকল্পনার বিন্যাসপ্রণালী অনুযায়ী আপনার পুঞ্জিত নোটগুলোকে শ্রেণীবিভক্ত, বাছাই ও সূচিভুক্ত করতে হবে। বিশেষ একটি বিষয়ের নোট একটি বিশেষ কোটরে রাখা হবে এবং প্রত্যেক কোটরের নোট আবার অভ্যন্তরীণভাবে সূচিভুক্ত করতে হবে যেন প্রতিটি তথ্য প্রয়োজনমূহূর্তে তাৎক্ষণিকভাবে আপনি তুলে আনেতে পারেন। ব্যবহারের পর তথ্যটি পুনরায় যথাস্থানে রেখে দিতে হবে যেন পরে প্রয়োজন হলে পুনরায় তা চট করে বের করে নেয়া যায়। অবশ্যই পাতার এক পাশে নোট লিখতে হবে, উৎস ও অন্যান্য বিবরণ পাতার অপর পাশে লিখতে হবে। আপনার তথ্যের উৎস লিখে রাখতে কখনো ভুলে যাবেন না। প্রত্যেক পাতারই উৎস থাকতে হবে, এমনি কি যদি একই তথ্য বিচ্ছিন্নভাবে পর পর গ্রথিত অন্য পাতায়ও থাকে তবুও প্রতি পাতায় উৎস থাকতে হবে। এ ব্যাপারে কোন আলস্য বা শ্রমবিমুখতা দেখানো হলে পরে সময় ও অর্থের বড়ো রকম খেসারত দিতে হতে পারে।

নোট লেখার বুদ্ধিবৃত্তিক দিকটা কেমন? তা তাৎক্ষণিকভাবে শিক্ষা দেয়া যায় না। লক্ষ্য করা গেছে যে অনেক গবেষক নিজ নিজ ভাষায় তথ্য লিপিবদ্ধ করে আক্ষরিকভাবে কপি করে নেন। এ পদ্ধতির নোট লিখন বিশেষভাবে নতুন গবেষকদের ক্ষেত্রে খুবই প্রচলিত, যা সম্পূর্ণরূপে অবৈজ্ঞানিক। তাতে অযথা সময় ব্যয় হয়। তা আপনাকে মানসিকভাবে অলস ও অযোগ্য করে তুলবে, কারণ এ পদ্ধতি আপনাকে সক্রিয় চিন্তা থেকে বিরত রাখবে। আক্ষরিকভাবে কপি করতে গেলে আপনার চোখ সক্রিয় থাকে, মন সক্রিয় থাকে না। তা ছাড়া এই পদ্ধতিতে নোট নিলে নোটের বোঝা অকারণে ভারী হবে। যখন আপনি নোট লিখেন কখন আপনাকে আবার তা পাঠ করতে হয়, যা সময়ের অপচয় মাত্র। আক্ষরিকভাবে নোট লেখার সবচেয়ে বিপজ্জনক দিক হচ্ছে নিজের অজান্তে কম্ভীলকগিরির সম্ভাবনা, যা আইনত ও বুদ্ধিবৃত্তিগতভাবে একটি অপরাধ। একবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন পন্ডিত আরেকজন পন্ডিতের রচিত বই থেকে কিছু অংশ আক্ষরিকভাবে কপি করে তাঁর বইয়ের অন্তর্ভুক্ত করেন। এজন্যে তাঁর বইতে কোন কৃতজ্ঞতা স্বীকারও তিনি করেননি। ফলে শেষোক্ত গ্রন্থকার কর্তৃক তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের উপক্রম হয়েছিল। কাজটি ছিল একেবারে অনিচ্ছাকৃত। এই গবেষকের নোট লেখার পদ্ধতিই ছিল আক্ষরিকভাবে কপিকরণ। এমনও ঘটতে পারে যে আপনি বিষয়টি আলাদা করে নিয়ে তাতে উদ্ধৃতিচিহ্ন দিতে ভুলে গেলেন। তা হলে কিছু কাল পরে আপনি নিজেও ভুলে যাবেন যে এটি অন্য কারো লেখার উদ্ধৃতি ছিল।

নোট লেখার সময় আপনি উৎসও নির্বাচন করেন। অবশ্য নথিতে আপনার প্রাপ্ত সব কিছুই আপনি লিখে রাখেন না। সেগুলোর মধ্য থেকে কেবল প্রাসঙ্গিক তথ্যগুলো নির্বাচন করা হয়। নোট নেবার ক্ষেত্রে নির্বাচন প্রক্রিয়া সত্ত্বেও আপনি দেখতে পাবেন যে, আপনার নিবন্ধের জন্যে গাদা গাদা নোট নেয়া হয়েছে এবং সবগুলো নোট সামলানো অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে। আপনি সমুদয় নোট কাজে লাগাতে চান বলে এ সমস্যার সৃষ্টি হয়। নোটের উপর নিবন্ধে তাবৎ নোটের ঠাঁই করা যায় না। ইতোপূর্বেই নির্বাচিত নোটগুলো পরবর্তী পর্যায়ের নির্বাচনের ব্যাপারে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন ওঠে, কিভাবে নির্বাচন করতে হবে? যখন নোট নেবেন এবং যখন বিদ্যমান সকল প্রাসঙ্গিক বইপত্র পাঠ করবেন তখন আপনি অবশ্যই পূর্বেকার ধারণায় গুণগত পবির্তন সাধন করে অনেক প্রশ্নের অবতারণা করবেন। যখন গবেষণার কাজ এগিয়ে যাবে তখন গবেষক চূড়ান্তভাবে যেসব বিষয় নিয়ে কাজ করবেন সেসব বিষয়ে তাঁর পশ্চাদদৃষ্টি ও সম্মুখদৃষ্টি দুটিকেই বিকশিত করতে হবে এবং যখন তিনি অবশেষে নিবন্ধ লিখতে বসবেন তখন ইতোপূর্বে যেসব প্রশ্নের অবতারণা করেছেন সেগুলো সবই পুনরায় স্মরণ করবেন এবং নিবন্ধের চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়ন করবেন। অন্য কথায় তিনি তাঁর নিবন্ধের লক্ষ্য চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করবেন। তদনুযায়ী নিবন্ধের আলোচ্য বিষয়গুলোর ক্রমানুসারে নোটগুলো পুনর্বিন্যাস করতে হবে। যদি নিবন্ধে দশটি প্রধান বিষয় তুলে ধরা হয় তা হলে আপনার নোটগুলোকে দশটি ট্যাগাবদ্ধ কোটরে রাখতে হবে যেন পরে তা তুলে নিয়ে ব্যবহার করা যায়। এই দশটি কোটরে নোটগুলো পুনরায় কালানুক্রমিকভাবে সাজিয়ে রাখতে হবে। নোট ব্যবহারের এই পদ্ধতিতে নোটের রাজ্যে হারিয়ে যাবার এবং হতাশাগ্রস্ত হবার কোন কারণ নেই। এই পদ্ধতিতে ইতোমধ্যেই নোট–আকারে নিবন্ধটি তৈরি হয়ে যায় এবং এর পর তাকে আপনার ভাষায় রূপদান, সুসম্বন্ধকরণ, মূল্যায়ন ও উপসংহার প্রদানের কাজ বাকি থাকে। এ পর্যায়ে আপনি আপনার নিজস্ব মতামত এবং অনুসন্ধান সম্পর্কে আপনার সিদ্ধান্ত প্রদান করতে পারেন। এরূপ সিদ্ধান্ত অবশ্যই অন্যদের সিদ্ধান্ত থেকে পৃথক হবে। যদি আপনি আপনার যুক্তিসঙ্গত স্বাতন্ত্র্য প্রদর্শন করতে না পারেন তা হলে আপনার পক্ষে এর ফলাফল প্রকাশ করার প্রয়োজন নেই, কারণ তা প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানমার্গ ও চিন্তাধারায় কোন ভিন্নতর পথের সন্ধান দিতে এবং নতুন জ্ঞানের দ্বার উন্মোচন করতে ব্যর্থ হয়েছে। ইতোমধ্যে অন্যের পরিবেশিত বক্তব্যকে পুনর্ব্যক্ত করা একেবারেই নিরর্থক। আপনার নিবন্ধটি তখনই প্রকাশ করার কথা আপনি ভাবতে পারেন যখন আপনার মনে এ প্রতীতি জন্মাবে যে, মানুষের জ্ঞানভাণ্ডারে সংযোজন করার জন্যে নতুন জ্ঞান আপনি অর্জন করেছেন এবং বাস্তবিকই তা নতুন ও মৌলিক। তা হলে সকল সম্পাদক আপনার নতুন আবিষ্কারের বিষয় প্রকাশ করতে গভীরভাবে আগ্রহী হবেন।

তথ্য সংগ্রহ করা বলতে ধীকল্প (idea) প্রকাশ করা বোঝায় না

দলিলগ্রন্থ তথ্যসমূহ বহন করে। কিন্তু কোন ধীকল্পের কথা ঘোষণা করে না। কেবল দলিল হচ্ছে নৈর্বক্তিক, নির্জীবন বস্তু। দলিল তখনই কথা বলে যখন তাকে যথাযথভাবে ব্যবহার করে এবং ব্যাখ্যা করে কথা বলতে সক্ষম করা হয়। ব্যাখ্যা আসে ধীকল্প থেকে। ধারণা বলতে আমরা অভিধানে ও সামাজিক বিজ্ঞানে এর যে সংজ্ঞা আছে তা বুঝাই না। যেসব ধারণা তথ্য নিয়ে কাজ করে সেগুলোকে উপমা, অনুমিতি, প্রস্তাব ও সংজ্ঞা হিসেবে আমরা সনাক্ত করতে পারি। অনেক মৃত তথ্যও বিদ্যমান আছে যেগুলো নিয়ে বিতর্ক আছে। সারা বিশ্বে তা স্বীকৃত। পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয় ১৭৫৭ সালের জুন মাসে। এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু যদি বলা হয়, পলাশীর যুদ্ধ হচ্ছে মুর্শিদাবাদের দরবারের কতিপয় উচ্চাভিলাষী ও দেশদ্রোহী ব্যক্তির গোপন ষড়যন্ত্রের ফল, তা হলে সন্দেহের সৃষ্টি হবে। সবাই হয়তো একথা মেনে নেবেন না যে, এ যুদ্ধ একটি ষড়যন্ত্রের ফল। একথাও হয়তো সবাই মেনে নেবেন না ষড়যন্ত্রকারীরা সবাই উচ্চাভিলাষী ও দেশদ্রোহী ছিলেন। এমন কি কেউ কেউ এ যুক্তিও দেখাতে পারেন যে কলিকাতায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর উপনিবেশ স্থাপন এবং পরবর্তী কালে তার বাণিজ্য সম্প্রসারণ এবং ইউরোপের তৎকালীন পরিস্থিতি বাংলাদেশে একটা রাজনৈতিক পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছিল। কেউ কেউ আবার 'অবশ্যম্ভাবী' কথাটি মেনে নেবেন না। তাঁদের মতে, মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে 'অবশ্যম্ভাবী' বলে কিছু নেই। পলাশী যুদ্ধের তারিখ হচ্ছে একটি মৃত তথ্য, যা সম্পর্কে কেউ কোন প্রশ্ন তুলবে না। কিন্তু অন্যান্য সকল তথ্য সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। দ্বিমত পোষণ করা এবং সন্দেহ করা ধারণার ব্যাপার। একটি অভিসন্দর্ভকে দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে গিয়ে তার প্রণেতাকে অবশ্যই প্রয়োজনীয় যুক্তি এবং তথ্যের ব্যাখ্যা উপস্থাপন করতে হবে। যুক্তি ও ব্যাখ্যা ছাড়া ইতিহাস হচ্ছে তথ্যের একটি তালিকামাত্র, যা পাঠ করার জন্য জনগণের আদৌ কোন সময় ও উৎসাহ নেই। ধারণা সকল গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সঙ্গে জড়িত থাকে। অতীত কালে বাংলাদেশ 'মসলিন' রফতানি করতো। এই তথ্যটি থেকে শত রকম প্রশ্ন উত্থাপন করা যায়, যেমন কারা মসলিন উৎপাদন করতো, কিভাবে তারা তা উৎপাদন করতো, উৎপাদনের প্রযুক্তি কিরূপ ছিল, উৎপাদনের পরিবেশ ও সম্পর্ক কেমন ছিল, যেসব লোক তা উৎপাদন করতো তাদের আর্থিক অবস্থা কিরূপ ছিল, কারা তা ক্রয় করতো এবং কেন, বিভিন্ন সুতার কাউন্ট কি কি ছিল, ইত্যাদি। এসব প্রশ্নের উদ্ভব হয় ধারণা বা ধীকল্প থেকে এবং ধারণা যাচাই করার জন্য বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হয়। একটি নিবন্ধ কেবল তনই পাঠযোগ্য এবং স্মরণীয় হয়, যখন ধারণাপূর্ণ তথ্য তাতে থাকে।

সর্বোত্তমভাবে বিন্যস্ত তথ্যরাজি সর্বোত্তম ইতিহাস সৃষ্টি করে

এ পর্যন্ত যা কিছু বলা হলো তা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিবন্ধের আকারের (form) বিবরণ মাত্র। তথ্যকে আকার দিয়ে আপনি তাতে জীবন–সঞ্চার করেন। নিরাকার অবিন্যস্ত তথ্য ইতিহাস নয়, যেমন নিরাকৃতি হিজিবিজি লেখা শিল্প নয়। আকারবিহীন নিবন্ধ সাহিত্যের মর্যদা পায় না। একজন নিবিষ্ট গবেষকের এ সত্যটি আবিষ্কার করতে বেশী সময় লাগে না যে, তথ্য ও ধীকল্পকে যথাযথভাবে বিন্যস্ত ক'রে আকার দিয়ে তিনি গভীরভাবে উদ্দীপ্ত হন। সুষ্ঠুভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে একটি নিবন্ধ রচনা করে তিনি অন্তরে যে রোমাঞ্চ ও শিহরণ অনুভব করেন ভাষায় তা আদৌ প্রকাশ করা যায় না। ইতিহাসের সব মহৎ রচনারই মর্মমূলে রয়েছে প্রকৃষ্টতম পদ্ধতিতে বিন্যস্ত রথ্যরাজি। আকার (form) যা প্রকাশ করে পাঠক তা উপভোগ করে, স্মরণ করে। একই ঘটনা সম্পর্কে অনেকে লিখতে পারেন, কিন্তু সবাইর লেখা একই ফল উৎপাদন করে না।

তথ্যসমূহকে সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করে সুষ্ঠু আকার দেয়ার ব্যাপারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কথাটি মনে রাখা প্রয়োজন তা হচ্ছে ঠিক জায়গায় যথাযথ জোর দিয়ে সেগুলো সাজাতে হবে। ভুল জায়গায় জোর দেয়া হলে রচনার পুরো কাঠামো বিকৃত হয়ে যাবে এবং এর উদ্দেশ্য পন্ড হয়ে যাবে। সাধারণ যোগাযোগের ক্ষেত্রে যেমন দেখা যায়, একটি শব্দকে বিভিন্নভাবে উচ্চারণ করা হলে এবং তার উপর বিভিন্নভাবে জোর দেয়া হলে তার অর্থও বিভিন্ন হয়ে যায়, ঠিক একই ব্যাপার ঘটে যখন একই তথ্যের উপর বিভিন্নভাবে জোর দেয়া হয়। অর্থাৎ বিভিন্ন রকম জোর দেয়া হলে তার অর্থও বিভিন্ন হয়ে যায়। এ পর্যায়ে যদি ভ্রান্তভাবে জোর দেয়া হয়, তা হলে পুরো রচনাটাই ভ্রান্তিপূর্ণ হয়ে যাবে।

আপনার নিবন্ধকে সুষ্ঠু আকার দিতে হলে নিবন্ধটি এমনভাবে রচনা করতে হবে যেন তারিখ, বিষয় ও জোরালো তথ্যের কালপরম্পরা স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে যায়। নিবন্ধে শব্দ, বাক্য, প্যারাগ্রাফ ও পরিচ্ছেদগুলো সহজভাবে, প্রণালীবদ্ধভাবে এবং সাবলীলভাবে সামনে এগিয়ে যাবে। দুর্বোধ্য বাক্যবিন্যাস, ঘনঘন উদ্ধৃতি প্রদান, অপ্রচলিত শব্দ প্রয়োগ, অসংলগ্ন ও অপ্রয়োজনীয় দীর্ঘ বাক্য বিন্যাস, অনাবশ্যক পাদটীকা ও টীকা প্রদান অবশ্যই সযত্নে পরিহার করতে হবে। অর্থের দিক দিয়ে প্রত্যেক বাক্য পরবর্তী বাক্যের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত থাকবে এবং প্রত্যেক প্যারাগ্রাফ ও পরিচ্ছেদ একই রকম স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল গতিতে প্রবাহিত হবে। একটি বাক্যের কেবল একটি অর্থই থাকবে এবং প্রত্যেক প্যারাগ্রাফে মাত্র একটি বিষয়ই আলোচিত হবে। দুটি পরস্পর সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে একটি পরিচ্ছেদ গঠিত হবে এবং একই সূত্রে গ্রথিত সকল পরিচ্ছেদ নিয়ে আপনার রচনার গোটা কাঠামো নির্মিত হবে, যা সামগ্রিকভাবে পাঠকদের সামনে নতুন একটি বক্তব্য তুলে ধরবে, যা তাঁরা পূর্বে কখনো শুনতে পাননি অথবা রচনাটির দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেননি।